নারী, নাস্তিক, মিডিয়া ও সংস্কৃতি

মুহিব খান

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, যান্ত্রিক উপায়ে কোনো প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্য সংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন দেশীয় ও ইসলামি আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

নারী, নাস্তিক
মিডিয়া ও সংস্কৃতি

মুহিব খান

প্রকাশনায়
রাহনুমা প্রকাশনী ™

অপর্ণ

আমার সম্পাদিত
দেশের সর্বাধিক প্রচারিত
জাতীয় সাপ্তাহিক লিখনীর
(২০১৩-২০১৫)
অগণিত পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি!

লেখকের কথা

'নারী নাস্তিক মিডিয়া ও সংস্কৃতি' নামে এ বইয়ে স্বতন্ত্র কোনো লেখা নেই। কিন্তু এ বইয়ের অনেকগুলো লেখা এ শিরোনামের বিষয়বস্তু ঘিরেই, সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরও কিছু। কিছু প্রতিবাদ, কিছু স্বরূপ উন্মোচন আর কিছু স্বপ্ন বুনন। লেখাগুলো 'প্রচ্ছদ প্রসঙ্গ' আকারে বা 'সরল সংলাপ' নামে আমার ব্যক্তিগত কলামরূপে দেশের সর্বাধিক প্রচারিত 'সাপ্তাহিক লিখনী'সহ জাতীয় পত্রপত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে প্রকাশিত হয়েছে।

দেশ ও জাতির নানা ক্রান্তিলগ্নে পাঠক হৃদয় আলোড়িত করা, সচেতন মহলে ঝড়তোলা ও বিরুদ্ধ শিবিরে শঙ্কাজাগানো এসব লেখা কোনো বিশেষ সময়ের সঙ্গে নিবন্ধিত নয়, বরং সব সময় সব প্রজন্মের জন্যই অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। ধর্মপ্রাণ নীতি-আদর্শবান দেশপ্রেমিক মানুষের জাতীয় চিন্তা-চেতনার উর্বর উপাদান। এ দেশ ও এ জাতির পরীক্ষিত, কল্যাণকামী, চিরসংগ্রামীদের পক্ষে যুক্তি ও তথ্য উপাত্তে পূর্ণ এ লেখাগুলো আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে জাতীয় জীবনে সত্য সুন্দর ও বাস্তবতার পথনির্দেশ করতে পারে। অব্যর্থ হাতিয়ার হয়ে কাজে আসতে পারে দেশ-জাতি-ধর্ম-সত্য ও স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অবিরাম ষড়যন্ত্রকারীদের বিপক্ষে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিরোধ লড়াইয়ে। এটুকুই প্রত্যাশা।

মুহিব খান
বাগিচা প্যালেস, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা।
ফেব্রুয়ারি ২০২৩

সূচি

কোথায় বাঙালি সংস্কৃতি? ১১
মিডিয়ার হালচাল ও আমাদের মিডিয়া............ ২১
হায় মিডিয়া! ২৮
ফ্যাশন ক্যান্সার ৩০
‘ধর্ম যার, উৎসব তার’ ৩৭
টেলিভিশনে ইসলামি অনুষ্ঠান............ ৩৯
ভাষার প্রতি ভালোবাসা বনাম ভাষা নিয়ে তামাশা............ ৪৭
তোদের শিকড় নাই ৫৩
নারীটোপ ৫৫
চির মহীয়সী নারী............ ৬০
এফএম প্রজন্ম............ ৬৩
ভাস্কর্যের নামে মূর্তি-সংস্কৃতি ৬৭
মূর্তি সরা............ ৭২
তুফান তলো ৭৩
রাজনীতির রং বদলায় মিডিয়ার ঢং বদলায়............ ৭৪
বাংলা বর্ষবরণে সাম্প্রদায়িকতার ছোবল............ ৭৯
মাজারের বাজার ৮৫
ভারতীয় টিভি-চ্যানেলের সর্বগ্রাসী আগ্রাসন ৯২
নারী হয়ে নারীদের ক্ষতি করবেন না ৯৮
এসো নারী এসো............ ১০৫

নাস্তিক সমাচার..১০৭
নাস্তিক..১১১
প্রাণের ভাষা বাংলা চাই.. ১১৩
সাংস্কৃতিক সংঘাত অনিবার্য..১১৭
নারী স্বর্গে সংসদে গেলেও ঝগড়া করে ১২৩
স্বতন্ত্র ইসলামি টিভি চ্যানেল : কী কেন এবং কীভাবে.......................................১২৮
সাংস্কৃতিক যুদ্ধ ও আমাদের কথা.. ১৩৭
আবার জেগে উঠো ১৪৩
নারী : প্রতারণা আর ভোগের অসহায় শিকার ১৪৫
জাগো বাংলাদেশের নারী... ১৫২
আমাদের মিডিয়া_‘সম্ভব না’ থেকে ‘সম্ভাবনা’র পথে...১৫৪

কোথায় বাঙালি সংস্কৃতি?

যারা বাঙালি, তাদের সংস্কৃতিই বাঙালি সংস্কৃতি। ভিন্ন ভিন্ন জাতি, গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতিতেও ভিন্নতা থাকে। এ ভিন্নতাগুলোই একেকটি জাতিকে স্বতন্ত্র পরিচয় দান করে। এ স্বাতন্ত্র্য নির্ণীত হয় বিভিন্ন আঙ্গিক ও দৃষ্টিকোণ থেকে। এক হিসেবে পুরো বিশ্বের সমস্ত মানুষ একটি জাতি; মানবজাতি। এরপর আমেরিকান, ইউরোপিয়ান, এশিয়ান ইত্যাদি নানা মহাদেশের নামে নানা জাতীয়তায় বিভক্ত হয়েছে পৃথিবীর মানুষ। বিভক্ত হয়েছে নানা দেশ ও ভাষার নামেও। স্বাধীন দেশ-সীমা ও ভাষাকে পুঁজি করে গড়ে উঠেছে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয়তা। এ-জাতীয়তাবাদের আরেকটি স্বতসিদ্ধ মৌলিক এবং একই সঙ্গে বিশ্বাস ও আচরণগত ভিত্তি হচ্ছে—ধর্ম। নিজ নিজ ধর্মের বিশ্বাস ও চরিত্রভেদে গঠিত এ-জাতীয়তারও অপরিসীম গুরুত্ব ও বাস্তব ভিত্তি রয়েছে।

তবে কোনো রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা যদি ধর্মভিত্তিক না হয়, তা হলে সে রাষ্ট্রের নাগরিকদের জাতীয়তা ধর্মপ্রধান না-হওয়ারই কথা। কিন্তু 'যার যার ধর্ম তার তার কাছে' বলে যে-কথাটির বহুল প্রচলন রয়েছে, এর ভিত্তিতে বলা যায়, কোনো মানুষের ওপর এমন কোনো অদ্ভুত বা অস্বাভাবিক জাতীয়তাও চাপিয়ে দেওয়া যাবে না, যা তাকে তার নিজ ধর্ম থেকে বিচ্যুত হতে উদ্‌বুদ্ধ বা বাধ্য করে।

আমাদের এই বাংলাদেশের জাতীয় দিবস ও উপলক্ষ্যগুলোতে যে-সংস্কৃতি চর্চার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়, তা হলো বাঙালি সংস্কৃতি, বাংলাদেশি সংস্কৃতি নয়। আমরা আমাদের দেশ ও মানচিত্রের সীমানায় সন্তুষ্ট না থেকে পার্শ্ববর্তী পশ্চিমবঙ্গকেও সঙ্গে নিয়েই বাংলাভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের পরিচয়কে অবলম্বন করি। যা বাংলাদেশি সংস্কৃতি বা দেশীয় সংস্কৃতি পরিচয়ে সম্ভব নয়।

এ-হিসেবে বিষয়টি বিপুল রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে পাওয়া বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র, মানচিত্র এবং এর স্বাধীনসত্তা ও স্বকীয় পরিচয়ের পরিপন্থি।

আমরা যখন বাঙালি সংস্কৃতির শ্লোগানে কোনো জাতীয় দিবস পালন করি, তখন এদেশেরই পাহাড়ি অবাঙালি নাগরিকদের আমরা জাতীয় গণ্ডি থেকে ঠেলে বের করে দিই। কাছে টেনে নিই পশ্চিমবঙ্গের নাগরিকদের। অথচ বাংলাদেশি বা দেশীয় সংস্কৃতির শ্লোগানকে প্রাধান্য দিলে বাদ পড়ত পশ্চিমবঙ্গ, আর সঙ্গে থাকত বাংলাদেশের পাহাড়ি জনগোষ্ঠী, যারা এবং আমরা একই রাষ্ট্রের নাগরিক, একই মানচিত্রের অধিবাসী এবং একই পতাকার ধারকবাহক।

এই যে ভারতের একটি বাংলা ভাষাভাষী অংশকে সঙ্গে পাওয়ার জন্যে বাংলাদেশেরই একটি বিশেষ অংশকে অস্বীকার করা বা মানসিক ও সাংস্কৃতিকভাবে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা—এটি সঠিক নয়। এটিও এক ধরনের সাম্প্রদায়িকতা। যে-সাম্প্রদায়িকতা ধর্মভিত্তিক নয়, ভাষাভিত্তিক। এর মাধ্যমে ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতার পথও সুগম হয়।

বাংলাদেশে মুসলমানদের ঈদ উৎসবকে ধর্মীয় উৎসব বলা হয়, জাতীয় উৎসব বলা হয় না, যেহেতু এ-জাতির মধ্যে অমুসলমানও রয়েছেন। ঈদ তাদের উৎসব নয়। যারা বলবেন, ‘ধর্ম যার যার, উৎসব সবার’ তারা মুসলমানদের ঈদুল আযহার উৎসবে ‘উৎসব সবার’ বলে কোনো হিন্দু ভাইকে কুরবানির গরুর গোশত নিশ্চয় খাওয়াতে পারবেন না। সুতরাং ‘উৎসব সবার’ বলার কোনো মানে থাকে না। ধর্মীয় উৎসবগুলো যার যার ধর্মীয় বিশ্বাস ও রীতির ভিত্তিতে হয় বলেই ধর্ম যার, সে-ধর্মের উৎসবও কেবল তার। অন্যরা হয়তো কিছু পিঠা-পায়েস মিষ্টি-মণ্ডা খেয়ে এর আমেজের সঙ্গে কিছুটা জড়িত থাকতে পারেন। এর বেশি নয়।

তেমনি এদেশে উদ্‌যাপিত বাঙালি উৎসবগুলোও এদেশের জাতীয় উৎসব হতে পারে না, কারণ এ-জাতির মধ্যে অবাঙালিও রয়েছেন। আমাদের দেশের পাহাড়ি ভাইরা বাঙালি নন, বাংলাদেশি। কাজেই বাঙালি উৎসব তাদের উৎসব নয়। যদিও এতে অংশগ্রহণের স্বাধীনতা তাদের রয়েছে।

আমাদের স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবস শুধুই আমাদের। বাঙালি পাহাড়ি হিন্দু-মুসলিমনির্বিশেষে সকল বাংলাদেশির। আমাদের ভাষা

দিবসও আমাদের। বাংলা যে-দেশের এবং যে-জাতির রাষ্ট্রভাষা; তাদের। বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলা, এদেশে বাংলাভাষাভাষীরা তো বটেই, পাহাড়িরাও এর স্বীকৃতি দেয়। কাজেই এ নিয়ে দ্বন্দ্বের অবকাশ নেই। আমাদের বৈশাখ-বর্ষা-বসন্ত শুধু আমাদেরই নয়, পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদেরও। কেননা বাংলাভাষা এবং বাংলা সন সকল বাঙালির। এসব উপলক্ষ্য দিবস বা উৎসব নিয়ে কোনো দ্বন্দ্ব না থাকলেও দ্বন্দ্ব ও মতানৈক্য উদ্‌যাপন-প্রক্রিয়া নিয়ে।

এ-বিষয়ে কারও দ্বিমত থাকতে পারে না যে, বাঙালি জাতির এ-উৎসবগুলো পালিত হওয়া উচিত খাঁটি বাঙালি সংস্কৃতির রীতিতে। যাতে কোনো বিশেষ ধর্মাচরণের প্রভাব থাকতে পারবে না। এ ক্ষেত্রে ভাবতে হবে বাঙালি জাতিটি নানা ধর্মের মানুষের সামষ্টিক রূপ। এ-জাতির প্রতিটি সদস্য কোনো-না-কোনো ধর্মের অনুকূলে নিজ নিজ সাংস্কৃতিক বিশ্বাস ও আচার গড়ে তুলেছে। এটিই তার সংস্কৃতি। অর্থাৎ একজন বাঙালি মুসলমানের সংস্কৃতি আর একজন বাঙালি হিন্দুর সংস্কৃতিতে বেশ কিছু বৈপরিত্য ও তারতম্য থাকবেই। এর সমাধান কী।

যদি বলা হয় সার্বজনীন উৎসবগুলোতে যার যার সংস্কৃতি থেকে নিজ নিজ ধর্মীয় আচারটুকু বাদ রেখে বাকিটা পালন করুন, তাহলে দেখতে হবে বাঙালির প্রধান দুই ধর্ম ইসলাম ও সনাতন ধর্মের রীতি-পদ্ধতি ব্যতিরেকে সর্বজনীন কতটুকু আর বাকি থাকে, যা হিন্দু-মুসলিম সবাই মিলে উৎসব উদ্‌যাপন পালন করতে পারেন।

এ ক্ষেত্রে বাঙালি যেকোনো উৎসবে বোরকা ও সিঁদুর দুই-ই বাদ পড়বে। বাদ পড়বে আজান ও উলুধ্বনি। টুপি ও ধুতি। হিন্দু ধর্মীয় রাখিবন্ধন, মঙ্গল প্রদীপ, ভাইফোঁটা, প্রতিমা, বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী, সীতাহার ইত্যাদিও বাদের তালিকায় শীর্ষে থাকবে। যেমনটা মুসলমানীয় হিজাব, তাসবিহ, তিলাওয়াত, তাবিজের বেলায় হয়ে থাকে। কোনো ধর্মীয় সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গ যদি বাঙালি সংস্কৃতির অংশ না হয়, তবে শাখা-সিঁদুরের বা রাখি-প্রতিমা-প্রদীপের কী অধিকার আছে, বাঙালি সংস্কৃতির অংশ বনে যাওয়ার?

আমরা যারা অসাম্প্রদায়িক সর্বজনীন সাংস্কৃতিক উৎসবের কথা বলে বলে বৈশাখ-বসন্ত পালনে জাতিকে পথনির্দেশ করে থাকি, তাদের ভেবে দেখা উচিত আপাদমস্তক হিন্দু ধর্মীয় রীতি-আচার ধারণ করে নিয়ে আমরা এ কেমন অসাম্প্রদায়িক উৎসব পালন করছি?

হিন্দু সংস্কৃতির নামই কি বাঙালি সংস্কৃতি? এটা হলেও পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু বাঙালিদের জন্য হতে পারে, বাংলাদেশের মুসলিম বাঙালিদের জন্য নয়। এই বাংলাদেশের সবুজের ভিড়ে ষোলো কোটি মানুষের নব্বই ভাগেরও বেশি মানুষের ঘরে ঘরে যে-জায়নামাজটি সযত্নে গুছানো বা বিছানো আছে, যে-কুরাআনের কপিটি সুদৃশ্য তাকে বা শিকায় সুরক্ষিত আছে, যে-তাসবিহ-ছড়াটি শহর-নগর-পাড়া-গাঁয়ের অগণিত হাতের আঙ্গুলের ফাঁকে দুলছে, যে-ওড়নাটি কোটি কোটি বাঙালি নারীর সম্মান ও আভিজাত্যকে সযতনে আগলে রাখছে, যে-দোয়া ও আয়াতখচিত তাবিজটি অসংখ্য খেটে খাওয়া বাঙালির গলায়, বাহুতে, কোমরে শোভা পাচ্ছে, যে-সুউচ্চ সুরম্য মিনারগুলো বাংলার হৃদয়জুড়ে সুবজে শিকড় গেঁথে আকাশের নীলে হেলান দিয়ে সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে, যে-পবিত্র উচ্চারণ প্রতিদিন পাঁচবার এই বাংলার আলো-বাতাসের মাঝে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে হাজার বছর ধরে, এগুলো কি তবে বাঙালি সংস্কৃতির আওতায় কিছুতেই পড়ে না?

খুব বেশি দিন আগে তো নয়, বাংলার সাধ্বী-বিদুষী নারীরা রিকশায় চড়ে দশহাতি কাপড়ে হুড প্যাঁচিয়ে পর্দার সঙ্গে চলাফেরা করতেন, শুধু মুসলিমই নয়, অনেক হিন্দু সম্ভ্রান্ত পরিবারের নারীরাও, এটাও কি বাঙালি সংস্কৃতি নয়? এটাকে পশ্চাৎপদতা বলে উলঙ্গ ও উশৃঙ্খল হওয়াটাকে বরং বাঙালি সংস্কৃতি বলে চালালেই চলবে? বাংলার কোটি কোটি মানুষের মুখে কোটি কোটিবার উচ্চারিত—আসসালামু আলাইকুম, ইনশাআল্লাহ, মাশাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ, সুবহানাল্লাহ।কি এখনো বাঙালি সংস্কৃতি হয়ে উঠতে পারেনি? তা হলে হিন্দু ধর্মের—রাখি, প্রদীপ বাঙালি সংস্কৃতি হয়ে গেল কোন ফাঁকে? এমনকি শাখা-সিঁদুরও? এর ব্যাখ্যা বাঙালি সংস্কৃতির নামে বিশেষ ধর্মের সংস্কৃতির বাহকদের কাছে থাকার কথা নয়। কারণ

তারা যা করছেন ও বলছেন; সুগভীর ষড়যন্ত্রের আলোকে জেনে বুঝেই করছেন। বিষয়টি স্বীকার করে নেওয়ার নৈতিক সাহস তাদের নেই।

আমাদের অসাম্প্রদায়িক (!) সর্বজনীন (!) বাঙালি উৎসবগুলোতে দেশের সাংস্কৃতিক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানগুলোর সামগ্রিক প্রস্তুতি প্রচার ও কর্মসূচিতে স্পষ্টতই প্রমাণিত হয়ে ওঠে, তারা আসলে নিজেরাই এখনো অসাম্প্রদায়িক অবস্থানে নিজেদের নিয়ে যেতে পারেননি। তারা যখন ধর্মনিরপেক্ষতা এবং অসাম্প্রদায়িকতার কথা বলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনারও দোহাই দেন, তখন বিষয়টি খুব অদ্ভুত ঠেকে। তারা যদি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায়ই বিশ্বাসী হতেন, তা হলে মানচিত্রের সীমানা লঙ্ঘন করে ওপারের সংস্কৃতিকে নিজেদের সংস্কৃতির সঙ্গে মিশিয়ে একাকার করে দেওয়ার জন্য টানাহ্যাঁচড়া করতেন না। বাঙালি জাতির সর্বজনীন উৎসবে বিশেষ ধর্মের চিহ্নিত রীতি-রেওয়াজের অনুপ্রবেশ ও প্রতিষ্ঠা ঘটানোর উলঙ্গ প্রয়াস চালাতেন না।

কাজটি তারা কাকের মতো চোখ বুজে করে যাচ্ছেন, আর ভাবছেন, অন্যরাও চোখ বুজে আছে, কেউ কিছু দেখছে না বা বুঝছে না। আসলে তারা বোকার স্বর্গে বাস করছেন।

তত্ত্বকথা থেকে বেরিয়ে যদি সহজে বলি, তবে একথা এখন সুস্পষ্ট ও প্রমাণিত, বাংলাদেশের মানুষকে প্রকৃত অর্থে বাংলাদেশি হতে দিতে চাচ্ছেন না তারা। হতে দিচ্ছেন না সঠিক বাঙালিও।

বাঙালির ইতিহাস-ঐতিহ্য থেকে কোনো একটি বিশেষ ধর্মীয় অনুভূতি ও আচারকে পরিপূর্ণ বাদ রেখে অন্য আরেকটি ধর্মের যাবতীয় আচারকে কৌশলে প্রবেশ করানোর মাধ্যমে বাঙালি সংস্কৃতি ও উৎসবের প্রকৃত বাঙালিয়ানা এবং অসাম্প্রদায়িক ভাবমূর্তিকে বিনষ্ট করা হচ্ছে সর্বোতভাবে। এদের প্রচার-প্রোপাগন্ডায়, আনুষ্ঠানিকতায়, এমনকি এদের সমর্থক সকল মিডিয়ায় 'বাঙালি সংস্কৃতি' কথাটি মাত্রাধিক উচ্চারিত হলেও দেশের সাধারণ সচেতন মানুষ খুঁজেই পাচ্ছেন না—কোথায় বাঙালি সংস্কৃতি।

পহেলা বৈশাখ বাংলা নববর্ষের সূর্যোদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এদের আয়োজনে যা যা কর্মসূচি পালিত হয়, এর কত ভাগ প্রকৃতপক্ষে বাঙালি সংস্কৃতি, আর কত ভাগ নয়, তা খতিয়ে দেখা দরকার। দেশ ও জাতিকে সাংস্কৃতিক দিকনির্দেশনা প্রদানের কেন্দ্রে পরিণত করা হয়েছে টিএসসি থেকে রমনা পর্যন্ত এলাকাটুকুকে ঠিকই, কিন্তু দেশ ও জাতি আসলে কী দেখছে ও শিখছে, তা গবেষণার দাবি রাখে।

রমনার বটমূলে বৈশাখের প্রথম সূর্যকে দলবেঁধে বরণ করে নেওয়া হয়ে থাকে আগমনী গানের মাধ্যমে। রেওয়াজটি আদৌ বাঙালিয় ইতিহাস থেকে পাওয়া নয়। ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে ইলিশ-পান্তার যে মহড়া উদ্‌যাপন করা হয়, এটাও বাঙালির আবহমান কালের ঐতিহ্যের অংশ নয়। কবে থেকে কোথা থেকে এটি আবিষ্কার হলো, কীসের ভিত্তিতে? মনগড়া কোনো কিছুকে বাঙালি সংস্কৃতি বলে হুজুগ সৃষ্টি করে ইলিশ-পান্তার ব্যাবসা জমানোর কাজটি সুবিধাবাদীরা বেশ ভালোভাবেই করতে পেরেছেন।

বাংলাদেশের গ্রামে বা শহরে কোথায় ক'জন বাঙালি বৈশাখের ভোরে ইলিশের ভাজা টুকরো দিয়ে পান্তা ভাত খেতেন বা খান—এর কি কোনো প্রমাণ আছে?

তবে বছরের প্রথম দিন নানা জাতের শাক-পাতা দিয়ে ভাত খাওয়া, অথবা ভালো কিছু রান্নাবান্নার চেষ্টা করা, এমন কিছু রীতির সন্ধান তবু মেলে, ইলিশের না। এটা বানানো ব্যাবসার ফাঁদমাত্র।

বৈশাখের পোশাকের রং সাদা ও লাল হওয়ার কোনো ঐতিহাসিক বা ঐতিহ্যগত ভিত্তি নেই। গ্রামবাংলার বাঙালি নারীরা এ-দুই রংয়ের মিশ্রণেই পোশাক পড়তেন—এমনটি কোথায় পেল তারা? বাংলার ঐতিহ্যের সবুজ তবে গেল কই? হিন্দুদের শাখার সাদা রং আর সিঁদুরের লাল রং মিশিয়েই কাপড় পড়াতে হবে বাঙালিদেরকে? এ সংস্কৃতি তো বাঙালি সংস্কৃতি নয়। এটি এলো কোত্থেকে? যে-গ্রামবাংলার বাঙালি ঐতিহ্য আমাদের ভিত্তিমূল, সে-গ্রামের কত জন নারী-পুরুষ এ লাল-সাদার সঙ্গে পরিচিত বা অভ্যস্ত, কবে থেকে? এটিও তো বানোয়াট।